ঘোষ বাগানের দানো - অজেয় রায়
Ghosh Baganer Dano by Ajeo Ray

জ্যৈষ্ঠ মাস। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। লাভপুর লাইনের লাস্ট বাসটা সবে পেরিয়েছে।

বাসরাস্তার ধারে শিবপর চায়ের দোকানের ঝাপ আধখানা খোলা। ভিতরে তাসের আসর বসেছে লণ্ঠনের আলোয়। খেলুড়ে চারজন। শিবপদ স্বয়ং। এ ছাড়া ব্রজ দাস, কেষ্ট মণ্ডল ও জটাধর। খেলা চলছে ঘণ্টাখানেক। টুয়েন্টি নাইন। চলবে আরও খানিকক্ষণ।

এই চারটি মানুষেরই বেজায় তাসের নেশা। সন্ধ্যা হতেই বাকি তিনজন এক এক করে জমা হয় শিবপদর দোকানে। উসখুস করে। তারপর খদ্দেরের ভিড় কাটলেই বের হয় তাসের প্যাকেট। দোকানের ঝাপ আধখানা ফেলে চারজন গুছিয়ে বসে ভিতরে তক্তপোশের ওপর। মফস্বল গ্রাম বাংলা। পিচ-বাধানো বাসরাস্তার দু'ধারে বিস্তৃত খেতের জমি, পুকুর, বাগান। কোথাও কাকুড়ে খোয়ই ডাঙা। মাঝে মাঝে এক একটি জনবসতি। ছোট বড় গ্রাম শহর।

গরমকালে রাত আটটার পর বড় একটা খদ্দের জোটে না শিবপদর দোকানে। 'তাসুড়েরা তখন জুত করে খেলায় বসে। শিবপদ তখন ছুটি দিয়ে দেয় দোকানের ছোকরা কর্মচারীটিকে। দু-একজন ছুটকো খদ্দের এলে খেলার মাকেই মালিক

একাই তাদের আপ্যায়ন করে। হয়তো অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে খেলা। ফের শুরু হয়।

শিবপদর বয়স বছর চল্লিশ। তার তালুড়ে বন্ধুরা কাছাকাছি বয়সি। শিবপদর বাড়ি দোকানের লাগোয়া বাসরাস্তার পাশে। এই গ্রামটির নাম নতুনগ্রাম। ছোট গ্রাম। পঞ্চাশ-ষাট ঘর লোকের বাস। তবে বাস স্টপেজ হিসাবে নতুনগ্রামের গুরুত্ব আছে। এখান থেকে উত্তর ও দক্ষিণে অনেকগুলো চওড়া মেঠো রাস্তা গিয়েছে দূর দূর গ্রামের দিকে। সারাদিনই এই স্টপেজে রাসযাত্রীর আনাগোনা। শিবপদর দোকান ছাড়াও এখানে আছে আরও একটা ছোট চায়ের দোকান। নতুন গ্রামের ই মুখুজ্যের। আর আছে একটা গমভাঙাই কল। সদ্য খুলেছে। তবে শিবপদর ছড়িা অন্য দুটো দোকানই সন্ধে নামলে বন্ধ হয়ে যায়।

মুলত চা-বিস্কুটের দোকান বটে শিবপদর। তবে সে কিছু মিষ্টি ও নোনতাও বানায়। এছাড়া তার দোকানটা হচ্ছে একটা সাইকেল স্ট্যান্ড। দূর গ্রাম থেকে যারা এখানে এসে বাস ধরে যায় ওদিকে বোলপুর বা উল্টোদিকে নানুর-কির্নাহার-লাভপুর লাইনে, কাজেকন্মে বা দৈনিক চাকরি বা ব্যবসা করতে, তারা অনেকে সাইকেলে এসে শিবপদর কাছে বাইক জমা রেখে যায়। কাজ শেষে বাসে এসে দোকান থেকে সাইকেল নিয়ে গ্রামে ফেরে। দোকানের গায়ে ছোট এক খড়ের চালার নিচে থাকে তালামারা সাইকেলগুলো।

নিয়মিত যারা সাইকেল রাখে তাদের থেকে কিছু ভাড়া পায় শিবপদ। উপরি আয়। তার কোনো অসুবিধে নেই। কারণ তাসের নেশায় লাস্ট বাসটা অবধি সে তো থাকেই দোকানে। নেহাতই কোনো সাইকেল মালিক না ফিরলে শিবপদ তার গাড়িটা নিয়ে গিয়ে রাখে নিজের বাড়িতে।

নিবম রাত। তাঁসুড়েদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা ও মাঝে সাঝে উচ্চস্বরে কিছু বিতর্ক ছাড়া আর কোনো মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। কখনও কখনও পিচ রাস্তা দিয়ে খুস করে বেরিয়ে যায় মোটর গাড়ি-ট্রাক।

খেলতে খেলতে জটাধর হঠাৎ ঘাড় কাত করে মন দিয়ে কী শোনে। তারপর বলে, কীসের শব্দ হচ্ছে জানি।” '। অন্যরাও কান পেতে সায় দেয়।

ঝনঝন্। ঘটাং টাং-আওয়াজটা এগিয়ে আসছে দ্রুতবেগে। অসমান মেঠো পথ দিয়ে সবেগে সাইকেল চালিয়ে আসছে কেউ। হরিপুরের দিক থেকে আসছে

শব্দটা। কী ব্যাপার?

ঘ্যাচ। সজোরে ব্রেক কষার আওয়াজ হয় দোকানের ঠিক সামনে। ঝনাৎ করে মাটিতে পড়ল একটা সাইকেল। শিবপদরা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে কাপের একপাশের কোন তুলে হুড়মুড় করে ঢুকে টলতে টলতে সটান উপুড় হয়ে পড়ল একজন দোকানের মেঝেতে।।

ভৰা মণ্ডল।

থরথর করে কাঁপছে ভবা। গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। শিবপদরা লাফ দিয়ে এগোয়।

কেউ লাঠি মেরেছে। কিংবা ছুরি। ছেনতাই করেছে ডাকাতে।' ব্রজ নিশ্চিত কণ্ঠে ঘোষণা করে।

“না না। মারেটারেনি। গায়ে রক্ত কই?” জটাধরের প্রতিবাদ—অন্য কিছু ব্যাপার। জল দে শিগগির।

শিবপন তাড়াতাড়ি মগে করে জল আনে। ভবাকে চিৎ করে দিয়ে ওর মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দেওয়া হয়। কিছু একটা ঘটেছে সাংঘাতিক সন্দেহ নেই। তবে দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। 'ভবা মণ্ডল থাকে হরিপুরে।

মাত্র মিনিট দশেক আগে ভবা নেমেছিল লাভপুর লাইনের বাস থেকে। ও বোলপুর শহরে গিয়েছিল। শিবপদর দোকান থেকে তার সাইকেল নিয়ে রওনা দিয়েছিল হরিপুর। মুখে জলের ছিটে পেয়ে একটু সুস্থ হয়ে চোখ মেলল ভবা। ঘোলাটে নয়নে দেখল শিবপদলের। উঠে বসে। কেষ্ট এক গেলাস জল দিতে ঢকঢক করে খায়। অতঃপর তার গলা দিয়ে ভয়ার্তস্বরে যে কথাটি বেরোয় তা শুনে অন্যরা হতভম্ব।

‘আঁ। ভূত!’ চারজনই চমকে ওঠে, “কোথায়? তক্তপোশে বসে কঁপা কাঁপা গলায় থেমে থেমে যে অদ্ভুত ঘটনা বলল ভবা তার

সারমর্ম এই

শিবপদর দোকান থেকে সাইকেলে উঠে হরিপুরের দিকে যাচ্ছিল ভবা। যে রাস্তা ধরে "নের পর দিন গিয়েছে। চিকে জ্যোৎস্নায় দিব্যি দেখা যাচ্ছিল পথ। তাই টলেনি। 'রে বাতাস বইছে। খোশমেজাজে গুনগুন করে গাইতে গাইতে প্যাডেল মারছিল।

মনে ঘুরছে বাড়িতে কিছু কাজের কথা। পদ্মদিঘির পাশ দিয়ে গিয়ে বাঁক নিয়েছে, সহসা রাতের অন্ধতা ভেঙে কেমন একটা চাপা অদ্ভুত বিকট হাসির আওয়াজ কানে যেতে খাত তুলে পুকুরপাড়ে তাকিয়েই তার আকেল গুড়ুম।

কিছুটা সামনে, দিঘির উচু পাড়ে বিশাল এক ছায়ামূর্তি। অন্তত দু মানুষ লম্বা। প্রকাণ্ড মাথা। চুলের গোছা উড়ছে। দু হাত নাড়তে নাড়তে সেটা নামছে ধীরে ধীরে। পাড় বেয়ে নিচে। নিঃশব্দে। গোটা দেহটা মিশকালো। চলনের ধরনটা অদ্ভুত। ভবা দিঘির ধারে ওইখানে পৌছানোর সময় ঠিক এটা তার ঘাড়ে এসে পড়ত।

ঝপ করে সাইকেলে ব্রেক কষে নেমে পড়েছিল ভবা। বিস্ফারিত চোখে মূর্তিটা দেখেছিল চার-পাঁচ সেকেন্ড। জমে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। ওটা যে কোনো জীবন্ত প্রাণী নয় তার সন্দেহ ছিল না। নির্ঘাৎ ওটা ভূত দানো পিশাচ জাতীয় কিছু। অশরীরী। ভবা অজ্ঞানই হয়ে যেত ভয়ে। কোনোরকমে মরিয়া হয়ে সে সাইকেলটা ঘুরিয়ে উঠে পড়ে ঊর্বশ্বাসে প্যাডেল মারে। কীভাবে, কতক্ষণে যে পৌঁছেচে দোকানে হুঁশ নেই। শুধু মনে হচ্ছিল যে এই বুঝি কারও হিমশীতল আঙুলের মুঠি আঁকড়ে ধরবে তার ঘাড়।

ভবা তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা শেষ করে যে এক গেলাস জল খান।

শিবপদর চোখাচোখি করে। চারজনের মনে একই প্রশ্ন। এতকাল ওই রাস্তা দিয়ে কত লোক যাতায়াত করেছে রাতবিরেতে কিন্তু ভূত-প্রেতের দেখা পায়নি তো কেউ! ভৰা মলও প্রায়ই ফেরে রাত করে। নেহাত ভিত বলা যায় না লোকটিকে।

‘আমি ভাই ও পথে একা ফিরছি না। মানে আজ রাতে। ভীত কণ্ঠে জানায় ভবা। “তাহলে কী করবে?” শিবপদ চিস্থিত। “এই দোকানেই শুয়ে থাকি রাতে। | ‘বাড়িতে ভাববে না?' ‘তা ভাববে বই কি! কী করা?”

কেষ্ট গজগজ করে ওঠে—ভূত-ফুত সব বাজে। চাদের আলোয় কলা বা খেজুর গাছের পাতা নড়তে দেখে ভুল করেছে। আচমকা দেখলে এমনি মনে হয় অনেক সময়।

'না ভাই, সত্যি বলছি। স্পষ্ট দেখলুম। গাছ-টাছ নয়। এগুচ্ছিল। ভবা কাতরে প্রতিবাদ জানায়।

আসলে কেষ্ট দাস চটেছিল ভবার ওপরে। খেলায় হারছিল কেষ্ট। অল্প কয়েক পয়েন্টে। আর আধঘন্টাটাক খেলা হালে হার মেকআপ করে জিতে যেত হয়তো। ভবা দিল সব ভণ্ডুল করে। হারলে কেষ্টর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আপাতত ভবা যদি এখানে ঠাই গাড়ে তাহলে খেলার দফা গয়া। কেবল ভূতের গল্পই চলবে।

কেষ্ট বলে ওঠে, 'চলো তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি। দিঘিটা পার করে দিই।' ‘পোঁছে দিবি?' শিবপদ ইতস্তত করে, 'তবে আর একজন কেউ যাক সঙ্গে। নইলে তোকে একা ফিরতে হবে। জটা যাবি?”

‘নাঃ, যা দরকার?' মুখে সাহস দেখালেও কেষ্টর হাবেভাবে বোধ হল যে জটা সঙ্গে শোল মন্দ হয় না।

“ঠিক আছে, চ। জটাধর নাজি।

পনেলোর মধ্যেই ফিরছি। ফিরে এসে আবার খেলব।' জানাল টে।

জিন রওনা দিল সাইকেল চেপে।

নিট পনেরো নয়। কের ও জটাধর দোকানে ফিরল প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে। কাপতে কাপতে। দুদ্দাড় করে সাইকেল চালিয়ে।

তারা দু'জনেও দেখেছে সেই ছায়া দানবকে। তবে দিঘির পাড়ে নয়। পদ্মদিঘি পাশ কাটিয়ে নিরাপদেই পেরিয়ে গিয়েছিল তিনজনে। অলৌকিক কারও দেখা মেলেনি। কিন্তু হরিপুরের কাছাকাছি গিয়ে তাদের নজরে পড়ে দূরে তালভাঙার খোলা মাঠে এক আচ্ছা বিরাট মূর্তি। যেমন বর্ণনা দিয়েছিল ভরা।

সেই বানোটা ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছিল রুপোলি চাঁদের আলোয়। একবার খনখনে গা শিউরানো হাসির শব্দ শোনা গেল। ওর অট্টহাসি। ক্রমে মুর্তিটা গিয়ে মিলিয়ে

গেল দিঘির দক্ষিণে ঘোষ বাগানের ভিতরে।

বহুক্ষণ কাঠ হয়ে নজর করেছে তিনজন। কিন্তু সেই ভৌতিক দানোর দেখা আর মেলেনি। অবশেষে ভরসা করে দোকানে ফিরেছে কেষ্ট ও জটা। ভবা অবশ্য চলে গিয়েছে হরিপুর।

সেদিন আর তাসের আসর বসল না।

বোলপুর শহর। সাপ্তাহিক বঙ্গবাতরি অফিসে উকি দিল দীপক। পাশে ভবানী প্রেসের কাজ চলছে খটাখট শব্দে। ভবানী প্রেসের মালিক এবং বঙ্গবার্তার সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি তার ছোট্ট কামরায় বসেছিলেন নিজের চেয়ারে। মাঝবয়সি শ্যামবর্ণ গাট্টাগোট্টা কুলবিহারীর পরনে ধুতি শার্ট। মাথা ঝুকিয়ে গোল গোল চোখে শুনছিলেন সামনে বসা এক ভদ্রলোকের কথা। দীপক দরজা ঠেলতেই কুপ্রবাবু বলে উঠলেন-‘‘এসো দীপক। তোমার কথাই ভাবছিলাম।' . দীপক ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসে।

কুঞ্জবিহারী বললেন, ‘আলাপ করিয়ে নিই। ইনি হচ্ছেন শ্রীতারকনাথ ঘোষ। বাড়ি নতুনগ্রাম। আমার বিশেষ পরিচিত। আমাদের বঙ্গবার্তার গ্রাহক। আর এ হচ্ছে দীপক রায়। বঙ্গবার্তার একজন রিপোর্টার। ভেরি ভেরি প্রমিসিং ইয়ংম্যান!

তারকনাথ ও দীপক পরস্পরকে নমস্কার জানায়। বছর পঞ্চাশের ছোটখাটো নিরীহ দর্শন তারকনাথ সসন্ত্রমে দীপরে পানে চেয়ে কাঁচুমাচুভাবে হাসলেন।

কুঞ্জবিহারী দীপককে বললেন, ‘তারকবাবু কম বলছিলেন জানো? ওদের গ্রামের কাছে সম্প্রতি 'ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে। ঠিক উপদ্রব বলা উচিত নয়। আবির্ভাব হচ্ছে। যে সে ভূত নয়। বিরাট সাইজ। দানো বলা যায়। ধারে গছে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে তাকে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। কী বলো?'

সব গ্রামেই ওরকম ভূত দেখা যায়। নীরস কঠে দীপকের মন্তব্য। না না। আমাদের গায়ে আগে কখনও ভূত-টুত দেখা যায়নি। এই হপ্তাখানেকের

একদম হঠাৎ। লোকে খুব ভয় পেয়েছে। ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান তারকনাথ, হরপুরের পথে কেউ একলা যেতে ভরসা পাচ্ছে না। অনেকে নিজের চোখে দেখেছে কিনা।

‘একটা কাজ কর না দীপক,' বলে ওঠেন কুঞ্জবিহারী, একদিন চলে যাও ওখানে। খোঁজখবর করো। যারা দেখেছে তাদের ইন্টারভিউ নাও। ভূতটার ডেসক্রিপশান। তার বিচরণক্ষেত্রের বর্ণনা। হঠাৎ এই ভৌতিক আবির্ভাবের কারণটা কী হতে পারে? খাস একটা নিউজ হবে। বেশিদূর তো নয়। এখান থেকে বাসে বড়জোর ঘন্টাখানেক। ‘আবার ভূত? পারব না।' দীপকের সাফ জবাব।

‘আহা, তোমার যে এ লাইনে হাতযশ আছে। তাই তো বলছি তোমায়। এরপর সম্পাদক মহাশয় চোখ ছোট করে, পুরুষ্টু ঝোলা গোঁফজোড়াটি নাচিয়ে রহস্যময় সুরে বললেন, 'আর যদি সম্ভব হয় তেনাকে একবার দর্শন করেও আসতে পারো।

"তিনি কি আমায় দর্শন দেবেন? মনে হয় না। তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলে দীপক। ‘আহা-হা, ট্রাই করতে দোষ কী? লা ফেভার করলে দেখে ফেলতে পারো। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। স্বয়ং রিপোর্টার দেখেছে। জম্পেশ একখানা স্টোরি হবে বঙ্গবার্তায়।

‘হাঁ।' নাক দিয়ে একটা শব্দ করে দ্বিতীয় প্রস্তাবটা উড়িয়ে দেয় দীপক। তবু ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে না করতে পারে না। হাজার হোক সম্পাদরে অনুরোধ। | ‘বেশ, যাব।' দীপক রাজি। তারপর সে তারকবাবুকে জিজ্ঞেস করে—“কাল থাকবেন গ্রামে?

না। পরশু আসুন, রোববার। জানালেন তারকবাবু। “হ্যা, চলে যাও পরশু,' উৎসাহ দেন কুবাবু, ‘তারকবাবু, দীপকের সঙ্গে ওখানকার লোকের আলাপ টালাপ করিয়ে দেবেন। একটু সাহায্য করবেন।'

রবিবার সকালে চা খেতে খেতে নিজের মনে গজগজ করে দীপক, যত্তসব। বোগা ব্যাপার।'

বছর যোলো বয়সি ভাইপো ছোটন আর তার ছোট বোন ভাইঝি ঝুমা লক্ষ করছিল। দীপককে। হোটন জিজ্ঞেস করে, গ হয়েছে কাকু?”

"আর বলিস কেন?' দীপক গজরায়, কোন গ্রামে ভূত দেখা গিয়েছে, আমাকে তাই কভার করতে যেতে হবে। আরে বাবা, বাংলাদেশের সব গাঁয়ে ঝোপেঝাড়ে আর পুরনো বাড়িতে তো লোকে হরদম ভূত দেখে। এডিটর আমায় পেয়ে বসেছে। বেকার খাটাবে।”

কাকু, আমি যাব। ভূত দেখব।' ছোটন লাফিয়ে ওঠে। ‘কাকু, আমিও যাব। কখনও ভূত দেখিনি। কুমাও নাচে।

‘ভা। ছোটন দাবড়ে দেয় বোনকে, অন্ধকারে উঠোনে যেতে ভয় পায়, আবার ভূত দেখবেন।' ‘হা হা, তুমি কেমন বীরপুরুষ, জানা আছে। ঝুমা দমে না।

দীপক থামায় দু'জনকে, দূর দূর 'ভূত কে দেখবে? রাতে থাকছি না। একটু খোঁজখবর নিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসব।”

কাকু, আমায় নিয়ে চলো না, জায়গাটা দেখে আসি।' ছোটনের আবেদন।

তা মন্দ নয়। ভাবে দীপক। একা একা একঘেয়ে লাগতে পারে। তবু ছোটন সঙ্গে থাকলে দুটো গল্প করা যাবে। সে বলল, 'আচ্ছা চ। বেলা দশটা নাগাদ খেয়েদেয়ে বেরিয়ে

‘কাকু, আমিও যাব।' ঝুমার আবদার।

না। তোমার মাস্টারমশাই আসবেন আজ দুপুরে। আজ থাক। ‘যাও, যাও। হতাশ মা দানাকে ভেচায়, ‘ভুত যখন ঘাড় মটকাবে বুঝবে ঠেলা।” “বিনে ভূত বেরোয় না। বিজ্ঞ ছোটনের মন্তব্য।

বেলা এগারোটা নাগাদ ছোটনকে নিয়ে দীপক পৌছে গেল নতুনগ্রামে। তারবাবুর সঙ্গে দেখা করল। তারকনাথ দীপককে নিয়ে এলেন শিবপদর দোকানে। পরিচয় করিয়ে দিলেন শিবপদর সঙ্গে। ভবা মণ্ডল তখন ছিল সেখানে। দোকানে বসে দু’জন অন্য গ্রামের লোক তখন বিস্ফারিত নেত্রে গিলছিল ভবার ভূত দেখার অভিব্রতা।

ঘোষবাগানের দানো—এই নামেই খ্যাতিলাভ করেছে ওখানকার অশরীরী সেই দানব ছায়ামূর্তি। যে বিচরণ করে রাতে। ঘোষবাগানের কাছাকাছি দিঘির গায়ে অথবা তাকে দেখা গিয়েছে ঘোষবাগানের পূর্বে তালডাঙার প্রান্তরে।

ঘোষবাগানের সানো বা ভূতের আবির্ভাবে শিবপদর সোনায় সোহাগা। কারণ এর ফলে তার দোকানে বিক্রি বেশ বেড়েছে। পাঁচ গাঁয়ের লোক হাজির হচ্ছে নতুনগ্রাম স্টপেজে। শিবপদর দোকানে বসছে খানিক। আসল উদ্দেশ্য, ঘোষবাগানের দানোর গল্প শোনা। এই সূত্র ধরেই উঠছে নানা লোকের যত শোনা

ও দেখা ভূতুড়ে কাহিনি। যক্ষ রক্ষ পিশাচ দানো মামদো বেহ্মদত্যি পেতনি শাকচুন্নিদের নিয়ে হরেক গা ছমছম দমবন্ধ করা গল্পে দিনভর সরগরম থাকে দোকান। সঙ্গে চা বিস্কুট মিষ্টি নোনতার সদ্ব্যবহারও চলে।

ঘোষবাগানের সানোর প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ভবা মণ্ডলই আসর জমিয়েছে বেশি। কারণ সেই দেখেছে প্রথম এবং তার অবসরও প্রচুর। তাকেই বেশি পাওয়া যায়। শিবপদর দোকানে।

কেট ও জটাধর ব্যস্ত মানুষ। সন্ধের আগে তারা বড় একটা আসতে পারে না দোকানে। আরও একজন ওই দানোকে দেখেছে বটে সচক্ষে। কেতুপুরের ভরত সর্দার। কিন্তু সে চাকরি করে বর্ধমানে। সপ্তাহে একদিন মাত্র বাড়ি আসে। ফলে ভবাই জাঁকিয়ে বসেছে।

ভবা থিয়েটারে পার্ট করত। এলেমটা পুরো কাজে লাগাচ্ছে। যোষবাগানের সানো দেখার গল্প শুরু করলে শ্রোতাদের আর নড়তে দেয় না। প্রায় প্রতিদিনই তার গল্পে রং চড়ছে। ঠান্ডা নিরীহ শিবপদকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা নেই। তবে কেষ্ট বা জটাধর হাজির থাকলে সে মোটেই খুশি হয় না। কারণ আসরটা তখন দখল করে নেয় ওরা কেউ। প্রথম ভূত দেখার পর কম্পিত বিপর্যস্ত ভবার উফশাসে দোকানে আগমন দিয়ে শুরু হয় কাহিনি। ভবা তখন কেটে পড়ে।

জনাথের 'অফশোস, ইস, কেন সেদিন গেলাম না ভৰাকে পৌছতে! তাহলে কি এমন অগ্রাহি সইতে হয়। কেউ তাকে পৌঁছে না, ভবা, কেই বা জটাকে পেলে। | শিবপদর অবশ্য এসব গৌরবে মাথাব্যথা নেই। সে শুধু শুনে যায়। কিছু বাড়তি রোজগার হচ্ছে। এতেই সে খুশি।

তবে রাতে হরিপুর যাওয়ার শর্ট কাট রাস্তায় যাত্রী কমে গিয়েছে একদম। আঁধার "মলে কেউ আর ও পথে একলা মাড়ায় না। অন্তত দু-তিনজন একসঙ্গে মিলে তবে যায়। খেলাগান, পথদিঘি, ভালডাঙার ধার দিয়ে-রামনাম জপতে জপতে।

শিবপদর দোকান প্রায় ফাকাই থাকে সন্ধের পর। ফলে দোকানে তাসের আদ্রা বসে তাড়াতাড়ি।

শিবপদ কেষ্ট জটাধর ব্রজ-চারজনই নতুনগ্রামের বাসিন্দা। তাই তাদের রাতে ঘরে ফিরতে অসুবিধা নেই। বাস রাস্তার উত্তরে ঘোষবাগান, হরিপুর, কেতুপুর। আর দক্ষিণে নতুনগ্রাম।

তবে অন্য পথে চললেও, রাতে বেরুলে গোটা অঞ্চলের লোকেরই গা শিরশির করে। পথে কোনো ছায়া নড়তে দেখলে বা কোনো বিদঘুটে আওয়াজ কানে গেলেই আঁতকে ওঠে।

কাগজের রিপোর্টার শুনে দীপকের চারপাশে ভিড় জমল। দীপক দোকানে বসে ভবা শিবপদ এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে নোট নিল। নিউজটা বানাতে কাজে লাগবে। তারপর সে বলল, 'ভূতটির বিচরণক্ষেত্রগুলি দেখতে চাই। প্রথমে যাব ঘোষবাগান। আমার সঙ্গে যদি কেউ আসেন দেখিয়ে দিতে--

দোকান তখন প্রায় ফাঁকা। ভবা এবং আরও জনাকয়েক দুপুরে খেতে গিয়েছে ঘরে। তারকনাথ ভিতু মানুষ। দিনেরবেলাতেও তার ঘোষবাগানে ঢুকতে ভয়। আমতা আমতা করে বলল, 'আমার একটু কাজ আছে। এখুনি যেতে হবে। শিবপন, তুমি যদি ভাই কাউকে দাও ওঁর সঙ্গে!

শিবপদ বলল, “ঠিক আছে, নকুল যাবে। আমার ভাগনে। নকুল, তোর ভাত খাওয়া হয়ে গিয়েছে তো? বেশ। বাবুদের সঙ্গে যা। খোলা মাঠে ঘোরাবিনে বেশি। যা রোদ্র।

নকুল বছর পঁচিশের যুবক। ছিপছিপে শক্ত গড়ন। রং কালো। সুশ্রী হাসিহাসি মুখখানী। পরনে লুঙ্গি ও শার্ট। খালি পা।

নকুলের সঙ্গে চলল দীপক ও ছোটন। শিবপন দোকানে ঝাপ ফেলে খেতে গেল। ‘তুমি কী করো? যেতে যেতে নকুলকে জিজ্ঞেস করে দীপক।

“আজ্ঞে, অনেক কিছু। মুচকি হেসে জবাব দেয় নকুল।

মানে?

‘এই যেমন ফিরি করি। বেলুন, প্ল্যাসটিকের খেলনা, ডুগডুগি, তালপাতার টুপি, হুইসিল-এমনি সব। শীতকালে মেলায় মেলায় ঘুরি। বোলপুর শহরেও যাই।

লটারির টিকিটও বিক্রি করি। মামাকেও সাহায্য করি দোকানের কাজে। বোলপুর থেকে মালপত্তর কিনে আনি দোকানের। চাষের কাজেও হাত লাগাই। বেকার তো। নানা ধান্দা করি।”

লেখাপড়া?'

স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি।

কলেজে পড়লে না কেন?

‘অনেক খরচ।' নকুলের মুখ ঈষৎ ম্লান হয়।

দীপক আঁচ করে অভাবী সংসারের সমস্যা। এ নিয়ে আর কথা বাড়ায় না। বাস রাস্তা থেকে ঘোষবাগানের দূরত্ব অন্তত আধ মাইল। পথের দু'ধারে বসতি নেই। শুধু চাষের খেত। তখন শস্য নেই মাঠে। এবড়ো-খেবড়ো খটখটে মাঠ। মোষবাগান।

ঠিক পথের ধারে নয়। চলার পথ থেকে প্রায় শ'তিনেক হাত তফাতে। মাঝখানে একটা শুকনো নালার খাত। আর কিছু ধেনো জমি।

পরদিঘির দক্ষিণে প্রায় বিঘে দেড়েক উঁচু জমির ওপর ঘোষবাগান। সেখানে পাঁচটি প্রাচীন আমগাছ এবং দু'টি কাঁঠালগাছ। উঃ, কত আম!” বলতে বলতে ছোটন সাঁ করে একটা ইট ছুড়ল আমল লক্ষ্য করে।

“আঃ, কী হচ্ছে? ধমক দেয় দীপক। তারপর ওপরে দেখতে দেখতে বলে, 'বাঃ, খুব আম হয়েছে! ভালো জাতের মনে হচ্ছে।

‘হ্যা, ল্যাংড়া আর গোলাপখাস। কলমের গাছ। জানায় নকুল। দুটি গাছে মস্ত মস্ত কাঠাল কুলছে প্রচুর।

‘এই বাগানের মালিক কে? প্রশ্ন করে দীপক।

‘মামা। ‘মানে শিবপদবাবু?

“হ্যা।” ঘাড় নাড়ে নকুল। বলে, 'মামার তো চাষের জমি খুব অল্প। এই আম কাঠাল বেচে আর দোকানের আয়ে কোনোরকমে চলে। এই বাগান করেছিলেন

মামার ঠাকুরদা। দিঘিটাও তিনি কাটিয়েছিলেন। তার অবস্থা খুব ভালো ছিল। মামার আসল বাড়ি হরিপুর। মামা ভারি ভালো মানুষ, তাই অন্য শরিকরা জবরদস্তি করে আর ঠকিয়ে নিয়েছে মামার পাওনা বেশির ভাগ সম্পত্তি। মাম তাই রাগ করে নতুনগ্রামে এসে ঘর করেছে। ওই দিঘিটারও ভাগ আছে মামার। সামান্য অংশ। তা দিঘি মজে গিয়েছে। মাছ হয় না। কাটানো হয়নি বহুকাল। মামা মামি, ওদের চার ছেলেমেয়ে, তার ওপর আমরা তিনজন। আমি, মা, বোন। বড় সংসার।'

'তোমার বাবা নেই? 'না। বাবা হঠাৎ মারা যেতে খুব কষ্টে পড়েছিলুম। তখন মামা এনে এখানে রাখল।'

আমগাছ দেখতে দেখতে নকুল বলল, গাছের ফল রাখা কি সোজা ব্যাপার? বড্ড চুরি হয়। এখন পাকার টাইম। এখনই বিপদ বেশি। আগের বছর অর্ধেক আম-কাঠাল চুরি হয়ে গেল। এবার দিনরাত পাহারা দিচ্ছি। দিনে মামার বাগাল ছেলেটা থাকে, রাতে আমি। তবে এ কদিন আর রাতে থাকছি না বাগানে। মানে ভূতের ভয়ে। তাই শুধু দিনে ডিউটি দিচ্ছি।'

বাগানের মাঝে দেখা গেল খড়ে ছাওয়া এক ছোট্ট কুটির। ভিতরে হাত দেড়েক উচু একটা বাঁশের বেথি। চারটে খোটার ওপর গায়ে গায়ে লাগানো বাঁশের কঞ্চি পেতে তৈরি। একটি লোক কোনোরকমে শুতে পারে তাতে। এক কোণে কিছু কাঠকুটো ঘুটে ঘড় জড়ো করা। মাটিতে একটা উনুন বানানো হয়েছে।

উনুনটা দেখিয়ে নকুল বলল, "রাতের ঘুম তাড়াতে চা বানিয়ে খাই। ওই বেঞ্চিটায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। রাতে একটু করে ঘুমিয়ে নিই, আর জেগে উঠে হাঁক পারি। অভ্যেস করে নিইচি। চোরে ভাববে যে গোটা রাত ঠায় জেগে আছি,' মুচকি হাসে নকুল, তবে ঠিকমতো ঘুম কি আর হয় ? বাগান থেকে বেরিয়ে দিঘির পাড়ে দাঁড়াল তিনজন।

মস্ত দিঘি। এখন অনেকটা বুজে এসেছে। দীঘির মাঝখানে সামান্য একটু জল। বাকিটায় শুকনো কাদা। দিখিতে পদ্মফুল আর নেই। কলমি নটে ইত্যাদি নানারকম শাকে প্রায় ঢেকে

৩২৪ । বৃহস। সমগ্র গিয়েছে দিঘিগর্ভ। পাড়ের ঢালে হলুদ ফুলে ভরা প্রচুর কন্টিকারির ঝোপ। দিঘি ঘিরে অনেকগুলো কলাগাছি আর লম্বা লম্বা নারকেল

গাছ।

দিঘির পাড়ে পাড়ে হাঁটে তিনজন। | সোজা উত্তরে একটা বড় গ্রাম। গাছপালায় ঢাকা। ফাকে ফাকে কিছু ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে।

"ওই গ্রামটা কী?" দেখায় দীপক।

'হরিপুর, জানাল নকুল, 'আর ওই দূরে বাঁ দিকে ওটা কেতুপুর। রাতে এখন লোকে দিঘির পাশ দিয়ে শর্ট কাটে হরিপুর যেতে ভরসা পায় না। তাই কেতুপুরের কাছ দিয়ে গিয়ে। ঢোকে। অনেকটা ঘুরপথে।' | নতুনগ্রাম থেকে চওড়া মেঠো রাস্তাটা ঘোষবাগানের কাছাকাছি এসে দু ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা শাখা পদ্মনিধিকে পাক খেয়ে চলে গিয়েছে উত্তরে হরিপুর। অন্যটা গিয়েছে উত্তর-পশ্চিমে কেতুপুর।

পদ্মদিঘি আর ঘোষবাগানের পুৰে জমি ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। তারপর শুরু হয়েছে রুক্ষ পতিত ভাঙা ভূমি। লোকে বলে তালডাঙা। প্রায় মাইল খানেক বিস্তৃত। সেখানে। কোথাও সমতল কঠিন কালচে মাটি। কোথাও বা উঁচুনিচু ঢেউ খেলানো কঁাকর বালি নুড়ি মেশানো খোয়াই। ওই ডাঙায় কিছু তাল ও খেজুরগাছ ছাড়া আর কোনো উদ্ভিদ নেই।'

নকুল দেখাল, 'ওই যে দূরে ডাঙার শেষে, বাসরাভার কাছে গ্রাম। ওর নাম ইসলামপুর।'

"এখানে শ্মশান-টশান আছে?' দীপকের প্রশ্ন। "আছে। হরিপুরের শ্মশান আর ইসলামপুরের গোরস্থান। এই ডাঙার সীমানাতেই।' 'ভূতটাকে ঘোষবাগানের দানো নাম দিয়েছে কেন?' দীপক কৌতূহলী। নকুল বলল, "লোকে ভাবছে যে ঘোষবাগানেই ওর আস্তানা। তাই "আচ্ছা, ভবা মণ্ডল বলছিলেন যে এখানে নাকি একটা খুন হয়েছিল?

'হা। গত বছর। তালডাঙায় ওইখানে একটা মৃতদেহ পড়েছিল। পুলিশ বলেছিল, লোকটা দাগি ডাকাত। ওর দলের লোকেই নাকি ওকে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল এখানে। কয়েকন গ্রেফতারও হয়েছিলতারপর হতে অনেক মাস কেটেছে। কোনো গোলমাল হয়নি। এখন হঠাৎ?

দীপক চারধার দেখল খানিকক্ষণ খুটিয়ে। তারপর বলল, ‘চল ফেরা যাক।' তার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

নতুনগ্রামে ফিরে দীপক ছোটনকে বলল, 'তোকে বোলপুরের বাসে তুলে দিলে, একা ফিরতে পারবি?” “কেন পারব না। কিন্তু তুমি?” ভাবছি থেকে যাই এখানে রাতটা।” বুঝেছি। ভূত দেখবে? ‘একটা ট্রাই করব। কাকু, আনিও থাক। ‘নো। এই বয়সে ভূত দেখার শখে কাজ নেই। শোন, বাড়িতে মানে দাদা-বউদিকে খবরদার বলবিনে আমি কেন এখানে রয়ে গেলাম। ঝুমাকে বারণ করে দিৰি বলতে। বললে কিন্তু কোনোদিন আর আইসক্রিম খাওয়াব না, মনে রেখো।

ছোটন চলে গেল বোলপুর।

দীপক শিবপদকে বলল, “আজ রাতে আমার একটা শোবার জায়গার ব্যবস্থা করতে পারেন? একটা খাট হলেই চলবে।'

‘এখানে থাকবেন! শিবপদ অবাক। “হ্যা। আজ রাতে একটু বেরোব। যদি আপনাদের ভূতের দর্শন পাই। তারপর তো আর ফেরার বাস পাব না। তাই রাতটুকু কাটাতে

‘এটা কিন্তু মশাই ঠিক হবে না। শিবপদ বাধা দেয়। “দেখুন, আমি রিপোর্টার। এমন রিস্ক ঢের নিয়েছি। আমার নার্ভ বেশ স্ট্রং।'

একটু চুপ করে থেকে শিবপদ বলল, রাত সাড়ে ন'টা-দশটা অবধি আমার দোকান খোলা থাকে। তাস খেলি। তার মধ্যে ফিরলে এখানেই শুতে পারেন। ওই তক্তপোশে। আর যদি দেরি হয় ?' সে ভাবনায় পড়ে। | ব্যস ব্যস। দশটাই যথেষ্ট। তার মধ্যে দেখা পাই ভালো। নইলে ফিরে আসব। সারারাত জাগার ইচ্ছে নেই মোটেই। পাঁচ-দশ মিনিট দেরি হতে পারে। একটু অপেক্ষা করবেন প্লিজ।

রাত আটটা নাগাদ শিবপদর দোকানে পাঁউরুটি, আলুর দম ও রসগোল্লা খেয়ে দীপক নৈশ অভিযানে রেডি। নকুল বলল তাকে, টর্চ এনেছেন?' “টর্চ? নাঃ। টর্চ কেন? দিব্যি চাদের আলো রয়েছে।'

মানে, চাদের আলোয় তো স্পষ্ট দেখতে পাবেন না। বাগানে দিঘির পাড়ে বড় বড় সাপ ঘোরে। বিষাক্ত গোখরো, কেউটে। তাই বলছি।'

ভূতের ভয়ে না হোক, সাপের কথায় ঘাবড়ে গেল দীপক। আমতা আমতা করে বলল, তাহলে তো বাগানে বা পুকুরপাড়ে না যাওয়াই উচিত। কী বলে? রাস্তা থেকে দেখৰখন। তবু একটা টর্চ থাকা ভালো। জোগাড় করে দিতে পার একটা ?”

‘দেখি। চলে যায় নকুল।

ইতিমধ্যে শিবপদর দোকানে এসে জুটেছে ব্রজনাথ, কেষ্ট ও জটাধর। তাস খেলার। লোভে। জটা উপদেশ দেয়, মশাই সাবধানে ঘুরবেন। ভূত সাপ কেউ ফ্যালনা নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে তাই বলছি। গোয়ার্তুমি করে একটা বিপদ ঘটালে মুশকিলে পড়ে যাব সবাই।'

“না না। সে ভাববেন না। সাবধান হব বইকি।' আশ্বাস দেয় দীপক। নকুল একটা টর্চ এনে দেয়। তবে সেটার আলোর জোর খুব কম।

নতুনগ্রাম থেকে হরিপুর যাওয়ার রাস্তাটা পদ্মণীঘির গা ঘেঁষে গিয়ে যেখানে উত্তরে ঘুরে সিধে গিয়েছে সেই বাকে হাজির হল দীপক। সেখান থেকে দিঘির পাড়, ঘোষবাগান এবং তালডাঙা—এই তিনের অনেকটা অংশ দেখা যায়। পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসল সে জুত করে।

ক্রমে চাদ ওপরে ওঠে। শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি। হালকা জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি রহস্যময়। আলোআধারির জগৎ। মেঘহীন আকাশে হীরের কুঁচির মতো ঝকঝকে অসংখ্য তারা।

বাতাস উঠেছে। তাই গরমের ঝাঝটা কমেছে। দিবি আরাম লাগছে ভোলা জায়গায়।

কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের চেয়ে একটি অস্বস্তি ক্রমে বাড়তে থাকে দীপকের মনে। উঃ, চারধার কী নি। শুধু কানে আসে অসংখ্য ঝিঝির তীব্র একটানা ঐকতান। আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত কিছু শব্দ। রাতে নির্জন পাড়াগাঁ অঞ্চলে সে কম ঘোরেনি। ভয়ও পেয়েছে কখনও কখনও। তেমনি এক ভয় বা অস্থির ভাব যেন বড় বেশি চেপে বসছে আজ।

কোনো সড়সড় মড়মড় আওয়াজ পেলেই দীপক টর্চ ফেলে দেখছে আশেপাশে। ঘোলাটে আলোর বৃত্তয় হাত দশেকের বেশি নজর চলে না।

কতক্ষণ দীপক এমনিভাবে বসেছিল খেয়াল নেই। বুঝি একটু ঝিমুনি এসেছিল। সহসা একটা আওয়াজে চটক ভাঙে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল বাগানের কাছে দিঘির পাড়ে বিরাট এক ছায়ামূর্তি। কোনো মানুষ অত লম্বা হতে পারে। প্রকাণ্ড মাথা। আবছা চন্দ্রালোকে বোঝা যায়, তার গোছা গোছা চুল উড়ছে বাতাসে। দুলছে হেলছে শরীর। সুদীর্ঘ হাত দুটো নাড়ছে এলোমেলো।

ধীরে ধীরে চলছে মূর্তিটা। ঝোপঝাড়ের গা দিয়ে কিন্তু কোনো শব্দ নেই। একবার একটা আওয়াজ শোনা গেল। অপার্থিব খনখনে চাপা হাসি। যেন হাসছে ওটা। দেখতে দেখতে সেই দানব মূর্তি অদৃশ্য হল ঘোষবাগানের অন্ধকারে।

আরও মিনিট পনেরো বসে রইল দীপক একই জায়গায় কাঠ হয়ে। তারপর উঠে শুটি শুটি হাঁটতে শুরু করে নতুনগ্রামের উদ্দেশে। শিবপদর দোকানের আলো দেখার পর তার যেন ধড়ে প্রাণ এল।

সম্পাদক কুঞ্জবিহারী টেবিলে প্রচণ্ড এক চাপড় মেরে হুংকার দিলেন—‘কনগ্রাচুলেশনস দীপক। স্টোরিটা ফাসক্লাস হয়েছে। ঘোষবাগানের দানো। হইচই পড়ে গিয়েছে। এ হপ্তায় বঙ্গবার্তার বাম্পার সেল। কত চিঠি পাচ্ছি জানো?

‘চিঠি? কী চিঠি লিখছে?’ দীপক কৌতূহলী। ‘ফর এ্যান্ড এগেনস্ট। কেউ খুব প্রশংসা করেছে লেখাটার এবং রিপোর্টারের সাহসের। কেউ আবার গালমন্দ করেছে। লিখেছে—মিথ্যে। বানানো গপ্পো।

কী বানানো? তেতে ওঠে দীপক। ‘আহা, চটছ কেন? 'তর্ক জমলেই তো নিউজের দর বাড়ে। তবে বিশ্বাসীর সংখ্যাই বেশি। অনেকে খোঁজখবর নিচ্ছে ব্যাপারটার। দীপক বলল, 'আমি কিন্তু আর ওমুখো হচ্ছি না। একবার দর্শনই যথেষ্ট। ‘‘না না, তোমার আর যাওয়ার দরকার কী? যার ইচ্ছে হবে সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে, সে নিজে যাক। সম্পাদক ফতোয়া দিলেন।

আরও দিন দশেক কাটল।

এক সকালে ভবানী প্রেসের পিয়ন এসে জানাল দীপককে, ‘এডিটারসাব আপনাকে ডেকেছেন। জরুরি দরকার।'

কী ব্যাপার? দীপক তখুনি ছোটে। সম্পাদকের কুঠরিতে বসেছিলেন নতুনগ্রামের সেই তারকনাথ। দীপক ঢুকতেই

কুঞ্জবিহারী গমগমে গলায় বলে উঠলেন, “শোন হে দীপক, তারবাবু কী বলছেন?' বলে তিনি নিজেই গড়গড় করে কিছু খবর শুনিয়ে দিলেন—

নতুনগ্রামে নাকি 'ভূতের ব্যাপারটা আরও জমেছে। এমনকী বঙ্গবার্তার দৌলতে কলকাতা থেকে একজন রিপোর্টার গিয়েছিল ব্যাপারটার খোজ করতে। খুব গুজব রটেছে।

‘আমি আসার পর আর কেউ 'ভূত দেখেছে?’ দীপক জিজ্ঞেস করে। ‘দেখেনি কেউ। তবে শুনেছে দু'জন। জানালেন তারকনাথ। ‘শুনেছে মানে? হাসি ?”

'হা, হাসি। তাছাড়া বাগানের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনেছে জোরে টানা দীর্ঘশ্বাস। কিংবা যেন ফুসছে কেউ। একেবারে ভুতুড়ে আওয়াজ। দুজন একসঙ্গে যাচ্ছিল। শব্দটা কানে যেতেই তারা প্রাণপণে সাইকেল চালিয়ে পালায়।

‘আহা, আসল কথাটাই যে বলা হল না। বাধা দেন কুঞ্জবিহারী, ‘জানে দীপক, এবার ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে।

কী ভাবে?'

‘ওঝা ডেকে কাড়ফোক করা হয়েছে দু'দিন আগে,' বললেন তারকনাথ, 'অনেক খরচা করে মুর্শিদাবাদ থেকে আনা হয়েছিল। নামকরা ওঝা। নতুনগ্রামের বলাই আর ইসলামপুরের হাবিব—এই দুই ছোকরাই প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিল। চাঁদা তুলেছে গায়ে গাঁয়ে। অনেকেই দিয়েছে। হরিপুরের লোকেই বেশি। ওদেরই তো বেশি অসুবিধে হচ্ছিল। ও, ওঝার কি চেহারা! মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। লম্বা চুল। ইয়া জোয়ান। লাল লাল চোখ। কপালে সিঁদুরের ফোটা। বাজখাই গলা। গায়ে লাল কাপড়, লাল ফতুয়া। মাথায় লাল ফেট্টি।'

'সারা সকাল কত কী যে করল। খুব মন্ত্র আওড়ালো। সংস্কৃত বাংলা হিন্দি। মন্ত্রের কী তেজ। ওহ্। সরষে ছিটিয়ে, গণ্ডি কেটে গেছে ঘোষবাগান, পদ্মদিঘি আর তালডাঙায় যে জায়গাগুলোয় দানোটার ঘোরাফেরা। বলে গিয়েছে যে এবার বাগান ছেড়ে পালাবে বাছাধন।

এই অঞ্চলই ছেড়ে যাবে। অন্য কোথা থেকে তাড়া খেয়ে এসে ঘোষবাগানে আস্তানা গেড়েছিল। বিষম প্রকৃতির দানো ভূত। এখনও কারও ক্ষতি করেনি বটে, তবে কত ঠিক ভবিষ্যতে। অতৃপ্ত আত্মা। হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে যায় মানুষের ওপর। যাক, এখন বাঁচোয়া।'

তারপর রেজাল্ট কী? আর ভূত দেখা যায়নি? জানতে চায় দীপক।

'নাঃ। এই দু'দিন তো দেখা যায়নি। অট্টহাসি বা ফোস-ফোসানিও শোনা যায়নি। অবিশ্যি এখনও হরিপুরের শর্টকাট পথে তেমন লোক চলছে না ভয়ে। তাবে দূর থেকে নজর রাখছে।'

দীপক ভুরু কুঁচকে ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, আজ হবে না। কাল যাব একবার আপনাদের ওখানে। ব্যাপার স্যাপার দেখতে।

''ভেরি ভেরি গুড', টেবিল চাপড়ালেন কুঞ্জবিহারী, 'নিউজটা ফলো করা উচিত। জানতাম, শুনলে তুমি ঠিক যাবে আবার।' পরদিন সকালে দীপক গেল নতুনগ্রামে। নাঃ, গতকালও রাতে অলৌকিক কিছু দেখা যায়নি বা শোনা যায়নি।

দিনভর গমগম করছে শিবপদর দোকান। নকুল এক বাঁকে হাসিমুখে জানিয়ে গেল দীপককে, 'স্যার, আর এক মাস এমন চললে মামা একখানা কোঠাঘর তুলতে পারবে। জানেন, ওঝা যেদিন এল দোকানে, লাভ হয়েছে তিনশো টাকা প্রায়। চা টিফিন মিল সাপ্লাই। মামা আর আমার তো কিছু দেখারই ফুরসত মিলল না।'

দীপক যখন ঘোষবাগানে ঘুরঘুর করছে, তখন বাগানের বাইরে দুটি যুবক ফিসফিস করছে। বলাই আর হাবিব।। বলাই বলল, ''আপদ তো চুকল। এবার কাজ সারি? হাবিব চিন্তিতভাবে বলল, আর ক'টা দিন যাক। ভিড় কাটুক।' ঘণ্টা দুই সেখানে কাটিয়ে দীপক বোলপুরে ফিরে এল। দীপত্র পরদিন ফের গেল নতুনগ্রামে। দুপুরে।

নাঃ, গত রাতেও দানোর দেখা মেলেনি। কোনো বিদঘুটে শব্দও শোনেনি কেউ। আগের রাতে তিনজন লোক সাহস করে জোট বেঁধে হরিপুরে গিয়েছে দিঘির পাশ দিয়ে শর্ট-কাটে। নিরাপদেই। লোকের ভয় ভাঙছে। | দীপক শিবপদর দোকানে বসে প্ল্যান ভঁজছে যে ওঝার কেরামতি নিয়ে আজ একটা লিখে ফেলব

বোলপুরে ফিরে। এমন সময় বাস থেকে একজন নামল, যাকে দেখে তার পিত্তি জ্বলে গেল।

সমাচারের রিপোর্টার মন্টু। সাপ্তাহিক সমাচারও বোলপুর থেকে প্রকাশিত হয় এবং বঙ্গবার্তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

মন্টু দীপককে দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, 'এই যে। এলাম। মন্টুর কাধে ঝোলানো ক্যামেরাটা দেখিয়ে দীপক গভীরভাবে বলল, ভূতের ছবি

'নাঃ। তেমন ক্যামেরা পাচ্ছি কই ?

মন্টু মিচকে হাসে, এই বাগান-টাগানের ছবি নেব। তুমি তো হে ফার্স্ট রাউন্ডটা মাত করে দিয়েছ। দেখি সেকেন্ড রাউন্ডে আমি কিছু করতে পারি কিনা? আজ রাতে এখানে থাকছ নাকি?'

'হম। ঠিক করিনি। তুমি?' ''ভাবছি থেকে যাব।' দীপক কিঞ্চিৎ দ্বিধায় ছিল রাতে থাকবে কিনা? তক্তপোশে শুয়ে মশার কামড় খেয়ে অনিদ্রায় কাটানো মোটেই আরামদায়ক ব্যাপার নয়। কিন্তু সে তখুনি স্থির করে ফেলে মনে মনে, রাতটা এখানেই কাটাব। যদি কিছু আজ স্পেশাল ঘটে, মন্টু একা লিখে ক্রেডিট নেবে? কভি নেভি।

রাত আটটা নাগাদ শিবপদর দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে দীপক গুটিশুটি বেরিয়ে পড়ে। ঘুরঘুর করে কাছাকাছি। লক্ষ রাখে মন্টু কোথায় যায়।

একটু বাদেই সে দেখল যে মন্টু হরিপুরের রাস্তা ধরে হাঁটা দিল। অর্থাৎ ওই পথের কোথাও বাসে ভূত দেখার তালে আছে। দীপক সে ধারে গেল না। পিচ রাস্তা ধরে খানিক পুবে হেঁটে 'তালডাঙায় নামল। বসল একটা ঝোপের আড়ালে।

নিশুতি থমথমে রাত। তারা-ফুটফুটে আকাশে ঝকঝকে চাদটা প্রায় বালার মতো গোল। রুপোলি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে মাঠঘাট।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটেছে। দীপকের কানে এল কারও হেড়ে গলার গান। নজর করে দেখল যে একজন আসছে গাইতে গাইতে হরিপুরের দিক থেকে তাড়ভাঙ্গ ভেদ করে।

আগন্তুক গায়ক পল্টুন আলি।

পল্টন কাঠ মিস্ত্রি অর্থাৎ ছুতোর। সে এখানে ছিল না মাসখানেক। হুগলিতে গিয়েছিল কাজ করতে। দু-তিন দিন আগে ফিরোছে, বাড়ি ইসলামপুরে। এসে শুনেছে সব। ঘোষবাগানের দানোর কথা। ওঝা ডাকা—ইত্যাদি এবং হয়তো এবার পালিয়েছে দানোটা।

পল্টনের যাত্রার শখ বেজায়। সে ক্ল্যারিওনেট বাজায় যাত্রাদলে। দেশে ফিরেই সে রিহার্সাল দেওয়া শুরু করেছে হরিপুরে তাদের পার্টির মহড়ায়। রিহার্সাল শেষে ফিরছে এখন।

পল্টনের ভয়-ডর কম। তাছাড়া ভূতের দেখাও মিলছে না কয়েকদিন। সে তাই নিশ্চিন্তে গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে আসছে তালডাঙার ভিতর দিয়ে ইসলামপুর যাওয়ার শর্ট-কাট পায়ে চলার পথ ধরে। ঘুরপথেও যাওয়া যায় তালডাঙা এড়িয়ে। তবে কী দরকার অযথা সময় নষ্ট। খুব খিদে পেয়ে গিয়েছে।

পল্টন যখন ডাঙার মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে এসেছে তখনই দেখা গেল ঘোষবাগানের দানোকে। দিঘির গা বেয়ে নামছে ডাঙায়।

পল্টন প্রথমে খেয়াল করেনি। মশগুল হয়েছিল গানে। সঙ্গের কুকুর শেরুর গরগর্জন শুনে মাথা ঘুরিয়ে দেখেই থমকে দাঁড়াল। শেরু পল্টনের 'ভীষণ ভক্ত। প্রায় সব সময়ে সঙ্গে ঘোরে। জাতে দেশি বটে কিন্তু ইয়া তাগড়া। তেমনি তেজি। কয়েকবার শের পল্টনকে সাবধান করে দিয়ে সাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

পল্টন কয়েক মুহূর্ত ওই নিজনি প্রান্তরে সেই ঘোর কালো চলমান সাক্ষাৎ বিভীষিকাকে দেখে ‘হয়া আল্লা' বলে পিছু ফিরে মারল টেনে দৌড়।

দীপক আবছা দেখতে পেল যে বহুদূরে আর একটি মানুষ গরুর গাড়ির রাস্তা ধরে পাই পাই করে ছুটে মিলিয়ে গেল নতুনগ্রামের দিকে। ও নির্ঘাৎ মন্টু।

দীপকও উঠে পালাবে ভাবছে, এমন সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখে সে হাঁ।

পল্টন পালাল বটে কিন্তু পল্টনের বাঘ কুকুর শেরু ঘাউ ঘাউ করে ঢাক ছেড়ে সোজা তেড়ে গেল দানোটার দিকে। আরে মরবে যে কুকুরটা!

এরপর দ্বিতীয় চমক। দীপক দেখল যে ঘোষবাগানের দানো পালাচ্ছে। বুঝি শেরর তাড়া খেয়ে লগবগ করতে করতে। খানিক পিছনে হেলে বিচিত্র ভঙ্গিতে ছুটে আসছে দীপক যেখানে বসে সেই দিকেই। হঠাৎ দানোটা একটা বেঁটে খেজুরগাছকে জড়িয়ে ধরল। এরপরই শোঁ শোঁ করে একটা তীক্ষ টানা শব্দ।

অদ্ভুত সেই আওয়াজটা শুনে থমকে গেল শেরু। পরক্ষণে সে বেজায় ভড়কে পিছু ফিরে মারল ছুট। ওর প্রভুর পথেই।

এসব দেখে দীপকের দেহ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। উঠে পালাবে যে সে শক্তিও নেই।

দানোটা তার থেকে মাত্র হাত চল্লিশ তফাতে। তার কেমন ভয় হল যে এখন উঠে পালাতে গেলে ভূতটার নজরে পড়ে যাবে। সে কাঠ হয় দেখে।

দীপক লক্ষ করে যে খেজুরগাছ জাপটানো দানোটা হঠাৎ আকারে ছোট হচ্ছে। ক্রমে ছোট হতে হতে প্রায় মিশে গেল মাটিতে। শো শো শব্দটা তখন থেমে গিয়েছে।

তী'রু চোখে নজর করে দীপক। দেখে, 'ওই খেজুরগাছের তলায় কে একজন নড়াচড়া করছে। কোনো মানুষ। এমন কিছু বড়সড় চেহারা নয় মানুষটার।

প্রচণ্ড কৌতুহলে গুড়ি মেরে এগোয় দীপক নিঃসাড়ে। কাছে গিয়ে ঝপ করে টর্চ মারে লোকটার গায়ে। আজ সে নিজের টর্চ এনেছে।

গায়ে আলো পড়তেই লোকটি চমকে মুখ ফেরায়।।

দীপক থ। এ কী! এ যে নকুল। লুঙ্গি ও শার্ট পরা। সে দুই লাফে গিয়ে নকুলের হাত চেপে ধরে বলল, 'কী ব্যাপার? তুমি? এখানে কী কচ্ছ?'

নকুল অসহায়ভাবে বলে ওঠে, 'স্যার, আলো নেবান প্লিজ। বলছি সব।

দীপক নকুলের হাত ছেড়ে দিয়ে লক্ষ করে, মাটিতে শায়িত বিরাট লম্বা এক দেহ। মানুষের মতো মনে হচ্ছে তবে আকারে যেন দানব। আলখাল্লা জাতীয় পোশাক পরনে। নিথর।

কী এটা?" দীপক প্রশ্ন করে। "আজ্ঞে ঘোষবাগানের দানো। মিনমিন করে নকুল। 'ইয়ার্কি হচ্ছে,' বলেই দীপক টর্চ ফেলে মূর্তিটার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকায়।

বীভৎস এক দানব মুণ্ড। কুচকুচে কালো চামড়া। ভাটার মতো লাল লাল চোখ। চিরকুট ধবধবে সাদা রাক্ষুসে দাঁতের সারি। মাথায় চুলের গোছা। গলা থেকে কালো রঙের বিশাল আলখাল্লায় ঢাকা গোটা দেহ।

"প্লিজ স্যার, আললা নেবান।' কাতরে ওঠে নকুল।। দীপক টর্চ নেয় এবং বোঝে নিজের ভুল।

ওটা কোনো মুণ্ড নয়। গাঢ় নীল গোল মস্ত বেলুনের ওপর হাতে আঁকা ভূতুড়ে মুখ। সত্যি চুল নয়। সরু সরু কালো রঙের কাগজের ফালি সাঁটা মাথায়।

দীপক বসে পড়ে চিৎ হয়ে শোয়া মূর্তিটা ঘেঁটেঘুটে টিপেটুপে দেখে। ফিনফিনে আলখাল্লাটার তলায় মনে হল একটা লম্বা মোটা বেলুন। তার ডগায় বাথা মুণ্ড আঁকা বেলুনটা। গলা মানে দুই বেলুনের জোড়ের কাছে কঞ্চির ফ্রেমে আটকানো লম্বা কালো। আলখাল্লাটা। সরু লম্বা দুটো বেলুন বাঁধা রয়েছে কাধের কাছে। যেন হাত। তাদের একটা ফেসে চুপসে গিয়েছে। পা বলে কোনো বস্তু নেই। একটা ভারি লাঠি, চাপানো রয়েছে মূর্তিটার গলার কাছে। 'এ যে বেলুন ভূত?' দীপক স্তম্ভিত। "আজ্ঞে তাই।" কাচুমাচুভাবে সায় দেয় নকুল। 'তুমি বানিয়েছ? 'আরে হ্যা। মানে এই বড়ি আর মাথাটা গ্যাস বেলুনের। তবে হাত দুটো গ্যাসের নয়,

অর্ডিনারি বাতাস বেলুন। আমি তো বেলুন বিক্রি করি। ঘরেই থাকে নানারকম বেলুন। গ্যাস সিলিন্ডারও থাকে।'

'গ্যাস বেলুন তো। তাই এই সরু দড়িটা দিয়ে বেঁধে ধরে থাকি নিচে। নইলে ছাড়লেই মুণ্ডসুদ্ধ জামা পরানো বডিটা হস করে উড়ে যাবে।'

'ও, এই বেলুন ভূত দেখিয়ে তুমি লোককে ভয় দেখাচ্ছ?" 'আর।' নকুল মাথা চুলকায়। 'কারণটা কী?' দীপকের স্বর কঠিন হয়।

'বাধ্য হয়ে স্যার', নকুল করুণ গলায় বলে, 'বাগানের ফল বাচাতে। এই বলাই আর হাবিব দুটো মহা চোর। গত বছর ওরাই সাফ করে দিয়েছিল বাগানে। হাতে-নাতে ধরতে পারিনি অবিশ্যি। তবে খবর পেয়েছি। এবারও দেখছিলাম যে

কেবলই দুটো ঘুরঘুর করছে বাগানে। কাহাতক আর রাত জেগে পাহারা দেওয়া যায়। এরা তাকে তাকে ছিল। এক রাত পাহারা না থাকলে বা বেশি ঘুমলেই ফুল সায্য করবে।

একদিন ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম যে দুটোরই খুব ভূতের ভয়। তখন আইডিয়া খেলল মাথায়। এক একদিন চুপিচুপি এসে অন্ধকারে বাগানে বসে বেলুনগুলো ফুলিয়ে ভূতটা বানাই। বাগান থেকে বেরিয়ে নিচু হয়ে ওটাকে খানিক উড়িয়ে লম্বা জামাটার আড়ালে আড়ালে দড়ি ধরে টেনে টেনে নিয়ে হাঁটি। কারও চোখে পড়ে যায়। ভূত-প্রেত দানো ভাবে। বিটকেল হাসি-টাসিও দিই। আবার বেলুন থেকে গ্যাস বেরুবার শব্দেও লোক ভয় পায়। গ্যাস সিলিভারটা বাগানে কুটিরের ভিতর গর্তে লনো থাকে।'

'আজ দেখলাম যে শয়তান দুটো শলা করছে গোপনে। ভয় হল, আজ হয়তো ফুল চরি যাবে। ভূতের ভয়টা কেটেছে কিনা। তাই আজ 'ভয়টা ফের চাগিয়ে দিলাম। কিন্তু পল্টনের কুকুরটা যা। বেটা সাংঘাতিক। দানো-ফানো মানে না! ভাগ্যিস কামড়ায়নি। ইস্, খেজুর কাটায় লেগে ভূতের পোশাকটা ছিড়ে গিয়েছে। একটা হাত ফেসেছে। 'কিন্তু লোকের যে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে? ধমকে ওঠে দীপক।

আর বড়জোর দিন পনেরো স্যার,' নকুল অনুনয় করে, তার মধ্যে আম-কাঠাল সব নেমে যাবে। তার 'আমি নিজে ফের ওঝা ডেকে আনব। মানে অন্য ওঝা। দেখবেন তার মন্ত্রের জোর। ঠিক দানোটা পালাবে। অন্তত বছরখানেকের মতো।' ফিক করে হেসে ফেলে নকুল।

'হু। মনে রেখ। নইলে কিন্তু দীপক ওয়ার্নিং দেয়।

'যে আজ্ঞে।' নকুল ঘাড় নাড়ে।

"মামা জানে তোমার কার্তি?"

'আজ্ঞে না।' বলেই নকুল হামলে পড়ল দীপকের পায়ে, "প্লিজ স্যার, বলবেন না। কাউকে। তাহলে মারা পড়ব। মামা আর আমার মুখদর্শন করবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' অভয় দেয় দীপক।

নকুল বলল, 'স্যার, এবার এগুলো গুটিয়ে ফেলি।

সে কিছু খুটখাট করে। কয়েকবার শোঁ শোঁ শব্দ হল বেলুন থেকে গ্যাস বা হাওয়া বেরুবার। চোপসানো বেলুনগুলো এবং আলখাল্লা দড়ি ইত্যাদি গুটিয়ে নিয়ে সে ভরল একটা ব্যাগে। তারপর বলল, 'স্যার, এবার তবে যাওয়া যাক। আপনি তো দোকানে যাবেন। আমি একটু ঘুরে বাড়ি ঢুকব লুকিয়ে।”

‘চল। দীপক পা চালায়।

শিবপদর দোকানে পৌঁছে দীপক দেখল যে সেখানে হুলস্থূল চলছে। তক্তপোশে জবুথবু হয়ে বসে আছে শ্রীমান মন্টু। তার গা-মাথা জামা-প্যান্ট সব ভিজে জবজবে। চোখে ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি। তাকে ঘিরে চারজন তাস-খেলুড়ে তো রয়েছেই, গ্রামের আরও কয়েকজন জুটেছে। সবাই উত্তেজিত সুরে কথা বলছে।

শিবপদর কাছে জানল দীপক, মন্টু নাকি হাউমাউ করে দোকানে ঢুকে আছড়ে পড়ে তক্তপোশে। তারপরই অজ্ঞান হারায়। জলের ঝাপটা দিতে ইশ ফিরেছে। দীপককে দেখে মন্টু ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'দেখেছ? উঃ, ডেঞ্জারাস!'

কোনোরকমে হাসি চেপে একবার মাথা ঝাকিয়ে দীপক গম্ভীরভাবে বসল তক্তপোশের কোনায়।

মন্টু কাদো কাদো স্বরে বলে ওঠে, আমার ক্যামেরাটা? কোথায় যে পড়ল? অসহায়। চোখে সে তাকায় সবার পানে। অর্থাৎ কিনা, দয়া করে কেউ যদি তার ক্যামেরাটি উদ্ধার করে এনে দেয়।'

কারও কিন্তু এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। দীপক বলল, ক্যামেরা কেউ নেবে না। খুব ভোরে গিয়ে খুজে নিও।' হতাশ মন্টু ধপ করে শুয়ে পড়ল। দীপকের মাথায় তখন দারুণ একটা স্টোরি ঘুরছেঘোষবাগানের দানোর পুনরায় আবির্ভাব। প্রেতদর্শনে সমাচারের রিপোর্টারের নিদারুণ দুর্দশা। তার প্রাণভয়ে পলায়ন। পতন ও মুছা। ক্যামেরা হারানো-ইত্যাদি।

কাল বাড়ি ফিরেই লিখে ফেলবে।

Golpa